দেশভাগ ও পশ্চিমবঙ্গে বাঙালির রাজনীতি

সুব্রত রায়চৌধুরী

১৯৪৭-এর ১৫ ই আগস্ট মধ্যরাতে দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতা প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে জন্ম নিল দুটি পৃথক রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তান। জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও ব্রিটিশ রাজশক্তির মিলিত বৈঠকে গৃহীত পূর্বশর্ত মেনে (৩ জুন, ১৯৪৭) ভাগ হয়ে গেল পাঞ্জাব এবং বঙ্গদেশও। স্বাধীন ভারতবর্ষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নিল পশ্চিমবঙ্গ নামক অঙ্গরাজ্য এবং পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তান। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে এই স্বাধীনতা এল বলে মুসলিমপ্রধান পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘু হিন্দুরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করতে শুরু করলেন। এই অভাব শুধু মানসিক অভাব ছিল না, শারীরিক সামাজিক আর্থিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তার অভাবও সেদিন পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘু হিন্দুদের বিপন্ন করে তুলেছিল। ফলে নতুন বাসভূমির সন্ধানে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা সর্বস্ব হারিয়ে সীমানা পেরিয়ে নিরাপত্তার সন্ধানে চলে এলেন পশ্চিমবঙ্গে। অবিভক্ত বঙ্গভূমির আয়তন ছিল ৮৫ হাজার বর্গমাইল। মাত্র পৌনে একত্রিশ হাজার বর্গমাইল এলাকা নিয়ে গঠিত পশ্চিমবাংলার বুকে আছড়ে পড়ল অসংখ্য গৃহহারা মানুষ। এদেশে তাদের নতুন নাম হল উদ্বাস্তু। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরের তথ্য থেকে জানা যায় এই সময় ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ এই পাঁচবছরে এ দেশে চলে এসেছিলেন ২০,৪২০০০ জন উদ্বাস্তু। পরবর্তী ১০ বছরে এসেছিল অর্থাৎ ১৯৬০ পর্যন্ত এই সংখ্যা ছিল ১১,৩০, ০০০। স্বল্প আয়তনের একটি নবগঠিত অঙ্গরাজ্যের উপর সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের মতো এই বিপুল উদ্বাস্তু স্রোত যখন আছড়ে পড়ল তখন স্বাভাবিক নিয়মেই যে প্রতিক্রিয়া ঘটার কথা ছিল তার প্রায় কোনোটাই তেমনভাবে ঘটল না। পরিবর্তে পশ্চিমবঙ্গের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক বৃত্তে এমন একটি ঢেউয়ের সঞ্চার করেছিল যা নাড়িয়ে দিয়েছিল এপার বাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে।

পূর্ববঙ্গে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অভিঘাতে ওপার বাংলা থেকে স্রোতের মতো ভেসে এসেছিল উদ্বাস্তু মানুষ। এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় এপার বাংলাতেও অনুরূপ দাঙ্গা ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তা হয় নি। ১৯৫০-এর সামান্য কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া এপার বাংলায় উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা প্রশ্রয় পায় নি। যদিও তখন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন জনসংঘ বেশ শক্তিশালী ছিল উত্তর ভারতে। বরং সেদিন

উদ্বাস্তুরা প্রগতিশীল আন্দোলনের মেরুদণ্ডে পরিণত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত আরো একটি বিপর্যয় ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তা হল উদ্বাস্তু বাঙালিদের সঙ্গে এপারের বাঙালিদের বিরোধ। বিপুল জনসংখ্যার চাপ পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে তখন বিপর্যস্ত করে তুলেছে। স্থায়ী পুরানো বাসিন্দারা নিজেদের অধিকার ও স্বার্থ বিপন্ন হবার দুশ্চিন্তায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ছিলেন। ১৯৫০-এর আগস্ট মাসে একটি বিখ্যাত সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তে এই আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন সম্পাদক। সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল —

> ক্ষুদ্রায়তন জনাকীর্ণ পশ্চিমবাংলায় যদি পূর্ববাংলার সত্তর আশি লক্ষ উদ্বাস্তুর বসবাসের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে এই প্রদেশের আদি বাসিন্দাদের রাজনৈতিক জীবন এবং সমগ্র প্রদেশের অর্থনৈতিক জীবন গুরুতররূপে বিপন্ন হয়ে পড়বে। এতে দু তরফেই অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠবে।... এই সরকারকে সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে যে, মুখ্যত পশ্চিমবাংলার আদি বাসিন্দাদের স্বার্থরক্ষার জন্যই এর অস্তিত্ব।

শিক্ষিত উচ্চ-বা উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে এই ভাবনা খানিকটা সত্যরূপে থাকলেও সাধারণ মানুষ কিন্তু শরণার্থীদের প্রতি ততখানি বিরূপ ছিলেন না। বরং সাগ্রহে সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এপার বাংলার লোকসাধারণ, রাজনৈতিকভাবে প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকার শরণার্থীদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে যথেষ্ট উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতা এবং অমানবিক মনোভাব শরণার্থী সমস্যাকে প্রবল করে তুলেছিল। সদ্যজাত একটি রাজ্যের পক্ষে এই সমস্যার সমাধান অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। তবু প্রাদেশিক সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই শরণার্থীরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। তবে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন রাজ্যসরকার উদ্বাস্তু মানুষের এই আনুগত্যকে বেশিদিন ধরে রাখতে পারে নি। ফলে ৫০-এর দশক থেকেই পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক আবহাওয়ার চরিত্র বদলাতে শুরু করে এবং উদ্বাস্তু মানুষেরাই ছিলেন এই বদলে যাওয়া রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের নেপথ্যনায়ক। এদের বাদ দিয়ে পঞ্চাশ বা ষাটের দশকের পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতির পর্যালোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে কংগ্রেসবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কমিউনিস্টরাই ধারাবাহিকভাবে নানা রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠিত করবার চেষ্টা করেছে। তবে এই কমিউনিস্টদের সঙ্গে শরণার্থীদের খুব একটা সু-সম্পর্ক ছিল না। বরং কমিউনিস্টদের প্রতি তাদের অবিশ্বাসই ছিল প্রবল। চল্লিশের দশকে ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনে কমিউনিস্টদের নেতিবাচক ভূমিকা পক্ষান্তরে ফ্যাসিবিরোধী মঞ্চে ব্রিটিশদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা, জাতীয় আন্দোলনে সুভাষচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধ সমালোচনা, সর্বোপরি দেশভাগে সমর্থন-ইত্যাদি বিষয়গুলিতে কমিউনিস্ট মতাদর্শ ও ক্রিয়াকলাপকে উভয়বঙ্গের অধিকাংশ বাঙালিই মেনে নিতে পারেন নি। বরং হিন্দু মধ্যবিত্তদের একটি বড় অংশকে কমিউনিস্টদের প্রতি বিরূপ করে তুলেছিল। ফলে চল্লিশের দশকে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি একটি জনগণ বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত হয়। ৪৩-এর দুর্ভিক্ষের দিনগুলিতে জনসেবামূলক

নানা কাজের মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি জনগণের মনে যেটুকু জায়গা করে নিয়েছিল সেই মাটিটুকুও হারাল এই দশকের দ্বিতীয় অর্ধে। এ বিষয়ে রণেন সেন বলেন—

> ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলন ও সোভিয়েতের সমর্থন আমাদের কাছে একসূত্রে বাঁধা থাকায় সুভাষবাবুর প্রচেষ্টাকে আমরা নিন্দা করি। কিন্তু যেভাবে সুভাষবাবুকে আমরা চিহ্নিত করি তার ফলে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতাকামী জনগণের অনেকের কাছ থেকে আমরা সরে যাই। (বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ)

উদ্বাস্তুদের একটা বড় অংশই ছিল একদা মধ্যবিত্ত হিন্দু। তাই তারাও কমিউনিস্টদের প্রতি মানসিক নৈকট্য অনুভব করেন নি। তাছাড়া আশ্রয়দাতা সরকার জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ছিল বলে প্রাদেশিক রাজনীতিতে তাঁরা কংগ্রেসের বিরোধিতাও করতে চায় নি। বিপরীতক্রমে কমিউনিস্ট পার্টিও প্রথমদিকে এই উদ্বাস্তুদের খুব একটা সুনজরে দেখে নি। তাদের ধারণা ছিল মুসলমানদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে ছিন্নমূল হবার কারণে এই উদ্বাস্তুরা স্বভাবতই হবে মুসলিম বিদ্বেষী। সমকালীন কমিউনিস্ট নেতৃত্ব উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে যে এমনটাই ভাবছিলেন তার সমর্থন পাওয়া যায় নীলাঞ্জনা চ্যাটার্জীর প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন প্রথমদিকে কমিউনিস্ট পার্টি 'actually suspicious of refugees as being potentially reactionary and anti Muslim.' ফলে এদের প্রশ্রয় দেবার অর্থ হয়ে পড়তে পারে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে উৎসাহিত করা। সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উত্থান ঘটার সম্ভাবনাকে সেকালের কমিউনিস্ট কর্মীরা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেন নি।

তবে বিচক্ষণ কমিউনিস্ট নেতৃত্ব এ ভাবনা থেকে খুব দ্রুত সরে এসেছিলেন। ভবিষ্যতে এই উদ্বাস্তুরাই যে পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতিতে অন্যতম নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নেবে তা তারা অনুভব করেছিলেন বলেই পার্টির পক্ষ থেকে বিজয় মজুমদারকে উদ্বাস্তুদের মধ্যে কমিউনিস্ট প্রভাব বিস্তারের দায়িত্ব দেওয়া হল। মূলত তাঁর নেতৃত্বেই উদ্বাস্তুদের সঙ্গে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির একটি সেতুপথ রচিত হল, উদ্বাস্তুদের মধ্যে মিশে গিয়ে তাদের সমস্যা, জীবনযন্ত্রণাকে সরকারের কাছে তুলে ধরার জন্য সংগঠন তৈরি করার মধ্য দিয়ে কমিউনিস্টরা ক্রমশই উদ্বাস্তুদের জীবনপথের সাথী হয়ে উঠল। তবে তার অর্থ এই নয় যে উদ্বাস্তুদের মধ্য থেকে যে আন্দোলন গড়ে উঠল প্রত্যক্ষভাবে তার নেতৃত্ব দিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি। অত্যন্ত বিচক্ষণতার জন্য পার্টির সহযোগিতাতেই উদ্বাস্তুরা নিজেরাই গড়ে তুলেছিল তাদের নিজেদের সংগঠন UCRE বা United Central Refugee Council তবে এই বাস্তুহারা আন্দোলনের নেতৃত্বের উপর কমিউনিস্ট পার্টির কর্তৃত্ব এতটাই প্রতিষ্ঠিত হয় যে প্রফুল্ল চক্রবর্তী এই সংগ্রামী উদ্বাস্তুদের 'Striking arm' বলে বর্ণনা করেছেন। সে সময়ে আন্দামান, দণ্ডকারণ্যর মতো বর্হিবঙ্গের নানা স্থানে বাঙালি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছিল কংগ্রেসী নেতৃত্ব। কিন্তু উদ্বাস্তু মানুষেরা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয় ছিন্নমূল মানুষকে জবর দখল কলোনি থেকে উৎখাত করা যাবে না। তাদের দণ্ডকারণ্য বা আন্দামানে নির্বাসনে পাঠানো যাবে না, পশ্চিমবঙ্গেই তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। উদ্বাস্তু মানুষের এই দাবি দাওয়াকে সমর্থনের মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট

পার্টি শরণার্থীদের সঙ্গে মানসিক নৈকট্য গড়ে তুলতে থাকে। অবশ্য উদ্বাস্তুদের সংগঠনে কমিউনিস্টদের প্রভাব বেশি থাকলেও এটি হয়ে উঠেছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী উদ্বাস্তুদের যৌথমঞ্চ। একান্তই দৈনন্দিন জীবনের নানা অভাব-অনটন থেকে মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাতেই এই যৌথমঞ্চ গড়ে তোলার কথা ভেবেছিলেন উদ্বাস্তুরা। নানা সমস্যায় জর্জরিত ছিল তাদের জীবন। ছিল বাসভূমি সমস্যা, ঘরবাড়ির সমস্যা, খাদ্য-পোশাক চিকিৎসার সমস্যা, কর্মসংস্থানের সমস্যা, অধিকাংশ মানুষ সরকারি 'ডোল' থেকে বঞ্চিত ছিল। যারা পেল তারা রিফিউজি ক্যাম্পে অস্বাস্থ্যকর, অমর্যাদাকর পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারছিল না, সব থেকে বড় কথা আপদকালীন সমস্যা খানিকটা মিটলেও জীবন যাপনের স্থায়ী কোন সুরাহা, কর্মসংস্থানের স্থায়ী কোনো পরিকল্পনা তাদের সামনে ছিল না। মানুষের এই অভাব-অভিযোগকে গুরুত্ব দেয়নি সেদিনের কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য সরকারের পক্ষেও এই বিপুল ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব ছিল না। ফলে উদ্বাস্তু মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে যে প্রাণের সংকট ছিল এদেশে তা ছিল না, বরং খানিকটা স্থিতু হতে পেরেছিলেন বলেই সেই ক্ষোভ সংঘটিত করে একটি পরিকল্পিত আন্দোলনের পথ খুঁজছিলেন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি। অবশেষে দীর্ঘ দুবছরের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে উদ্বাস্তু জনতা এবং কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে একটি সেতুপথ রচিত হল। বাম ও উদ্বাস্তুর মিলন ঘটল ১৯৪৯-এর ডিসেম্বরে। উদ্বাস্তু মানুষের সমস্যা, দাবি দাওয়া নিয়ে কলকাতার রাজপথে মিটিং মিছিল হল। আর তার সামনের সারিতে ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা। তারা তাদের ছাত্র সংগঠনকে সেদিন কলকাতার রাজপথে নামিয়ে আন্দোলনকে এতটাই ভিন্ন মাত্রা দিয়েছিল যে পুলিশ সেই মিছিলে গুলি চালায়। লাঠির আঘাতে বহু আন্দোলনকারী আহত হলেন। প্রফুল্ল চক্রবর্তী জানিয়েছেন এই প্রথম উদ্বাস্তু ও ছাত্রদের রক্ত মহানগরের রাজপথে এক হয়ে গিয়েছিল। আর এভাবেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এসে উদ্বাস্তুরা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে থাকল।

এই প্রথম উদ্বাস্তু মানুষেরাও নিজেদের একটি স্বতন্ত্র শক্তি বলে অনুভব করতে শুরু করল। ১৯৪৯-এর এই আন্দোলনের পথ ধরেই পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চাশ বা তার পরের দশকগুলিতে রাজনৈতিক মানচিত্র নতুন করে আঁকতে শুরু করলেন বামপন্থীরা। এতদিনে শরণার্থীরা জেনে গেছে দাবি আদায়ের আন্দোলন সফল না হলে কেড়ে নিতে হবে মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার অধিকার। আর এই সূত্র ধরে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সঙ্গে উদ্বাস্তু মানুষের যোগসূত্র ভেতরে ভেতরে ছিঁড়তে শুরু করে অন্যদিকে বামপন্থীদের সমর্থনে উদ্বাস্তু আন্দোলন গতি পেল। উদ্বাস্তু মানুষেরা সেদিন নিজেদের ভাগ্য নিজে হাতে গড়ে নেবার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিল। অনিল সিংহ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> পুনর্বাসন সম্পর্কে সরকারি মনোভাব ও কার্যকলাপে হতাশ হয়ে শরণার্থীগণ তাদের আশ্রয়স্থানের জন্য স্থায়ী পদক্ষেপ অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সঙ্গে গ্রহণ করে। একে দুঃসাহস বললেও অত্যুক্তি হবে না। সর্বতোভাবে উদ্বাস্তুরা জবরদখল কলোনি গড়ে তুলতে শুরু করেন ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে। ১৯৫০ সালের

> মধ্যেই কলকাতা, চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলি জেলাতে সব মিলে ১৪৯টি জবরদখল কলোনি গড়ে ওঠে। (পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থী সমস্যা)

উদ্বাস্তু মানুষের এই নতুন উপনিবেশ রচনার কথা ছড়িয়ে রয়েছে মানস রায়ের স্মৃতিকথায় ('কাটা দেশে ঘরের খোঁজ', বারোমাস), হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে (উদ্বাস্তু), ইন্দুবরণ গাঙ্গুলীর 'কলোনিস্মৃতি'তে। এই জবর দখল করে বাসভূমি রচনার প্রচেষ্টাকে ভালো চোখে দেখেনি জমির মালিক বা সরকার পক্ষ। তাই পুলিশের সাহায্যে কলোনিগুলিকে ভেঙে ফেলার প্রচেষ্টাও কম হয়নি। কংগ্রেস বা কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার এ বিষয়ে উদ্যোগী ভূমিকা নিলে উদ্বাস্তুদের সঙ্গে কংগ্রেসের রাজনৈতিক দূরত্ব আরো বাড়তে থাকে। আর এই সূত্রে উদ্বাস্তুদের সঙ্গে বাম সংগঠনগুলির নৈকট্য আরো গাঢ় হতে থাকে। বাস্তুহারা মানুষ প্রাণের শক্তি ফিরে পেল এই নৈকট্যের সূত্রে। জবরদখল রোধ ও বেআইনি ঘোষণা করার জন্য কংগ্রেসি সরকার উদ্যোগী ভূমিকা নিলে বাস্তুহারা মানুষের আর্তনাদ কলকাতার রাজপথে ক্রোধের হুঙ্কারে পরিণত হল। কংগ্রেস সরকার সেদিন 'অনধিকারী উচ্ছেদ বিল' পাশ করানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এর প্রতিবাদে সর্বাত্মক প্রতিরোধ তৈরি করল উদ্বাস্তুরা। সেদিন নেতৃত্বে ছিলেন বাম ও সমমনস্ক সহকারী রাজনৈতিক দলগুলি। ১৯৫১-২ ২৮ মার্চ ময়দানে মনুমেন্টের তলায় বিশাল জনসমাবেশে সর্বাত্মক প্রতিরোধের শপথ উচ্চারিত হল। সেই গণ আন্দোলনের বর্ণনা দিতে গিয়ে অরবিন্দ পোদ্দার লিখেছেন

> অনমনীয় সরকার লেলিয়ে দিলেন ঘোড়সওয়ার পুলিশ ও পদাতিক বাহিনী। জখম, গ্রেপ্তার, অনধিকার বিল' পাশ ইত্যাদি সত্ত্বেও কিন্তু উদ্বাস্তুকেন্দ্রিক বামমার্গী আন্দোলন স্তব্ধ করা গেল না। গোটা দশক ধরেই চলল বেআইনি কলোনিগুলোকে আইনানুগ স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলন (বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি)

কলোনি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে উদ্বাস্তুরা যেমন তাদের হারিয়ে ফেলা আত্মশক্তিকে আবিষ্কার করল, বামপন্থীরাও তেমনি তাদের পায়ের তলার মাটি খুঁজে পেল। আর এই দুই শক্তির সম্মিলিত জোট গোটা পঞ্চাশের দশক জুড়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মানচিত্রকে উত্তাল করে তুলল।

১৯৪৯-এ ময়দানে মিছিল মিটিং-এর মধ্য দিয়ে যার সূচনা, 'অনধিকার উচ্ছেদবিল'-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে তার উত্তাপ মানুষের মনে বিপ্লবের বহ্নিশিখা জ্বেলে দিয়ে গেল। ১৯৫৩তে ট্রামভাড়া ১ পয়সা বৃদ্ধির প্রতিবাদে যে গণবিক্ষোভ হয়েছিল তা ভাবিয়ে তুলেছিল সরকারকে। সেদিন গণ বিক্ষোভে উত্তাল পশ্চিমবঙ্গে মানুষ দেখেছে ট্রাম পুড়তে, কারখানার গেটে শ্রমিক ধর্মঘট দেখেছে, পুলিশের গুলির সামনে বুক পেতে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করতে দেখেছে। দেখেছে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গড়লেও সেই সরকারকে মাথানিচু করে হার স্বীকার করে নিতে হয়। তাই আন্দোলন শেষে বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছে সরকার। যারা গ্রেপ্তার হয়েছিল তাদের মুক্তি দিয়েছে সসম্মানে। এই ক্রমাগত গণবিক্ষোভ ও গণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মন থেকে একটু একটু করে দূরে সরে যেতে থাকে আধুনিক পশ্চিমবঙ্গের রূপকার বিধানচন্দ্র রায়ের

কংগ্রেস সরকার। বামশক্তির এই ক্রমাগত গণ আন্দোলনকে সমর্থন করে তাতে গতিসঞ্চার করেছিল পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু সম্প্রদায়। কারণ খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন নানা পরিসংখ্যান দিয়ে বোঝাতে চাইলেও এই শরণার্থী মানুষের পেটে ভাত ছিল না, ক্রমবর্ধমান বাজারদর তাদের ক্ষুব্ধ করেছিল। সরকার কন্ট্রোল, নেভি পারমিট প্রভৃতি নানারকম বিধি ব্যবস্থা আরোপ করলেও মানুষের রান্নাঘরে চাল পৌঁছুল না, চোরাচালান বন্ধ হল না। তাই কলকাতার রাস্তায় এই উদ্বাস্তু মানুষের ভুখা মিছিল মধ্যবিত্ত মানুষকেও ব্যথিত করল। ফলে উদ্বাস্তু মানুষের সাথে পথে এসে হাত মেলান এপার বাংলার স্থায়ী বাসিন্দারাও। তৈরি হল 'দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি, স্বল্পমূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহের দাবিতে এই সম্মিলিত জনতা পথে নামল। ধর্মতলায় লক্ষাধিক কৃষকের সমাবেশ হয়। সরকারের নির্দেশে সমাবেশে বেপরোয়া গুলিবর্ষণ হয়। ৮০জন মানুষ সেই গুলিতে শহিদ হলেন। অসংখ্য মানুষ জখম হলেন। প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ কিন্তু থামে নি। সেই বিক্ষোভ শহর থেকে শহরতলি, শহরতলি থেকে গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে। বামপন্থীদের নেতৃত্বে এই আন্দোলনে উভয় বাংলার মানুষই সেদিন অংশ নিয়েছিল। ফলে পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতিতে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুরাও ক্রমে একটা ফ্যক্টর হয়ে উঠল। উদ্বাস্তু মানুষও আর শুধু নিজেদের পরগাছা বা ছিন্নমূল ভাবলেন না। তারা এই বঙ্গের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা নিতে শুরু করলেন। ১৯৫২-তে ক্ষমতালাভের নির্বাচনী যুদ্ধে তারা তাদের এই ভূমিকাকে আবিষ্কার করলেন। প্রফুল্ল চক্রবর্তী আমাদের জানিয়েছেন—

> The refugee mass walked the streets like Nemesis the children of the padma seemed to have risen from the dead. They discovered a purpose in their lives. They were driven by some inner fury and moved like men possessed

আমরাও লক্ষ্য করলাম উদ্বাস্তুদের যৌথমঞ্চ UCRE এই ১৯৫২-র নির্বাচনে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল এবং ক্ষমতার পতাকা কংগ্রেসের হাত থেকে বামপন্থী মূলত কমিউনিস্টদের হাতে তুলে দেবার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করল। পঞ্চাশের দশকে উদ্বাস্তুদের এই ভূমিকাই পশ্চিমবঙ্গে ৭০-এর দশকে বামপন্থীদের ক্ষমতার অলিন্দে-প্রবেশের ছাড়পত্র দিয়েছিল।

একথা ঠিকই পরিসংখ্যানগত বিচারে ৫০-এর দশকে রাজনীতির মঞ্চে বামেদের ঝুলি প্রায় শূন্যই ছিল। বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রীসভায় একমাত্র কমিউনিস্ট বিধায়ক ছিলেন পরবর্তী কালের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। কিন্তু ৭০-এর দশকের শেষে বামেদের যে ক্ষমতায়ন সম্পূর্ণ হল তার সূচনা পর্ব ছিল এই পঞ্চাশের দশক। এই সময়ের নির্বাচনগুলির ফলাফল বিচার করলে উদ্বাস্তু আন্দোলন নির্ভর বামেদের এই উত্থানের একটা আভাস পাওয়া যেতে পারে। এই উত্থান ঘটেছিল শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণির হাত ধরে। ১৯৫২-র নির্বাচনে সাত মন্ত্রীসহ কংগ্রেসের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নেতা পরাজিত হন। ১৯৫৭-তে প্রবল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং বিধানচন্দ্র রায়কে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মহঃ ইসমাইলের কাছে প্রায় হারতে

হারতে জিততে হয়েছিল। অথচ এমন তো হবার কথা ছিল না। বিষয়টি আরো স্পষ্ট হতে পারে ১৯৫২, ১৯৫৭ ও ১৯৬২-তে বিধানসভা নির্বাচনের রাজ্য ও কলকাতার ফলাফল বিশ্লেষণ করলে—

রাজ্যের ফলাফল

সাল	মোট আসন	কংগ্রেসের প্রাপ্ত আসন	শতকরা আসন সংখ্যা
১৯৫২	২৩৮	১৫১	৬৩ শতাংশ
১৯৫৭	২৫২	১৫২	৬০ শতাংশ
১৯৬২	২৫২	১৫৭	৬২ শতাংশ

কলকাতা শহরের ফলাফল

সাল	মোট আসন	কংগ্রেসের প্রাপ্ত আসন	শতকরা আসন সংখ্যা
১৯৫২	২৬	১৭	৬৫ শতাংশ
১৯৫৭	২৬	০৮	৩০ শতাংশ
১৯৬২	২৬	১৪	৫৩ শতাংশ

নির্বাচনের এই ফলাফল দুটি ইঙ্গিত দিচ্ছে। প্রথমত কংগ্রেসের ভোট বাক্সে ৫০-এর দশকের গণ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে কমিউনিস্টরা সামান্য হলেও নিজেদের প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। কংগ্রেস তার এই ক্ষরণকে ৭০-এর দশক এবং তার পরেও বয়ে নিয়ে চলেছে। দ্বিতীয়ত বিধানচন্দ্র রায়ের উন্নয়নমূলক কর্মসূচির সুফল শহর কলকাতা পেলেও কলকাতার নাগরিক মানুষ কংগ্রেসকে প্রত্যাখ্যান করে কমিউনিস্টদের প্রতি ঝুঁকতে শুরু করেছে। মনে রাখতে হবে ইতিমধ্যেই কলকাতাসহ সংলগ্ন জেলাগুলিতে উদ্বাস্তুরা যথেষ্ট সংখ্যায় ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে শুরু করেছেন। কাজেই উদ্বাস্তু মানুষের ভোট উপমহাদেশের এই অঙ্গরাজ্যের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মনে রাখতে হবে এই উদ্বাস্তুদের সাহায্য নিয়েই, খাদ্য আন্দোলন, জমি দখলের আন্দোলন, কলোনি গড়ে তোলার ও সেখানে অধিকার বজায় রাখার আন্দোলন, ভেড়ি আন্দোলন প্রভৃতির মাধ্যমে কমিউনিস্টরা ৫০-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গে পা রাখার মাটি খুঁজে পেয়েছিল। বলা ভাল র‍্যাডিক্যাল রাজনীতির পোক্ত জমি তৈরি করতে পেরেছিলেন তারা। এই জমিতে পা রেখেই ৬০-এর দশকে (১৯৬৭, যুক্তফ্রন্ট সরকার) বামপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে শুধু যে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠলেন তাই নয়, তারা রাজ্যের ক্ষমতার অলিন্দে বামপন্থীদের পদচিহ্নও এঁকে দিলেন।

৫০ থেকে ৭০ এর দশকে বাঙালির এক রাজনৈতিক বোধের অভিযাত্রা। সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষবিষে বাঙালির হৃদয়ভূমি কালো হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল। সম্ভাবনা ছিল এদেশীয় বাঙালি ও বাঙালি উদ্বাস্তুর মধ্যে দ্বৈরথ সমর ঘটে যাবার। কিংবা বিষণ্ণতার মেঘে বাঙালির অবচেতন মনে নেমে আসতে পারত ক্লান্তি অবসন্নতা, স্তব্ধ করে দিতে পারত তার গতি।

কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি সেদিন অতন্দ্র প্রহরীর মতো পাহারা দিয়েছে বাঙালির বিবেককে। তাই সেসব কিছুই সেদিন বাঙালির বাঁচার লড়াইকে স্তব্ধ করে দিতে পারে নি, কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য লাগে এত বড় একটা মহাকাব্যিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েও বাঙালি কথাকারেরা তার কোনো বিস্তৃত ডকুমেন্টশন ধরে রাখতে পারেন নি তাদের উপন্যাসে গল্পে। বাঙালি উদ্বাস্তু ও বামকর্মীদের যে প্রবল প্রাণশক্তির পরিচয় আমরা কলোনি গড়ে তোলার মধ্যে পাই, প্রতিরোধে -প্রতিবাদে পাই, যে প্রাণশক্তি পুলিশ ও মালিকের গুণ্ডাবাহিনীর নারকীয় উল্লাসকে সেদিন স্তব্ধ করে দিয়েছিল, কলকাতার রাজপথে মিটিং-এ মিছিলে যার মুষ্টিবদ্ধ দু-হাত আকাশটাকে ছিনিয়ে আনবার স্বপ্ন দেখিয়েছিল— বাঙালি কথাকারেরা যেন অদ্ভুত এক নীরবতায় তাকে উপেক্ষা করে গেলেন। সংঘবদ্ধ মহামানবের মহাকাব্য লেখা হল না। সম্ভাবনা ছিল সাবিত্রী রায়ের 'স্বরলিপি' উপন্যাসে। জবরদখল করা জমির মালিক কলোনি ভেঙে দিয়ে হারানো জমি উদ্ধারের জন্য গুণ্ডা লেলিয়ে দেয়। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে গুণ্ডাবাহিনীর সেই তাণ্ডব দেখে যায় পুলিশ। অন্যদিকে বিপদের সঙ্কেত পেয়ে ঘরে ঘরে শাঁখ বেজে ওঠে। সংগ্রামী প্রতিরোধ গড়ে তোলে গ্রামবাসীরা। শ্রমিক শ্রেণির সঙ্গে যৌথ সংগ্রামেই বাস্তুহারাদের মুক্তিসম্ভব— এসব কথা বলার পরেও আন্দোলনের নেতা মধু মুখার্জী যখন বলে হিন্দুর স্বার্থরক্ষাই প্রধান কাজ তখন এই মহাকাব্যিক প্রেক্ষাপটে ফুটে ওঠা মানুষের হাতের জ্বলন্ত মশাল যেন নিভে যায়। ৫০-৬০-এর দশকের সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে ফুটে ওঠা সময়ের যথাযথ স্বরলিপি যেন আমাদের কানে এসে পৌঁছয় না। এ সময়ের প্রায় কোনো ঔপন্যাসিকই এই সময়ের স্বরলিপি লিখে রাখেন নি তাদের উপন্যাসে। সমরেশ বসু থেকে গৌরকিশোর ঘোষ যাঁরা সত্তরের রাজনৈতিক উন্মাদনা নিয়ে অসংখ্য উপন্যাস আমাদের উপহার দিয়েছেন, তেমন কোনো ঔপন্যাসিককে আমরা এই পর্বে খুঁজে পাই না। একমাত্র সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম পর্বের 'অর্জুন' উপন্যাসে সময়ের কালধ্বনি আমরা খানিকটা শুনতে পাই। এখানেও রয়েছে জবর দখল হয়ে যাওয়া জমির মালিকের হৃতজমি পুনরুদ্ধারের আকাঙ্ক্ষা ও প্লাইউড কারখানার মালিক কেওয়ল সিং-এর কারখানা সম্প্রসারণের আকাঙ্ক্ষা— এই দুই স্বার্থ যখন মিলে যায় তখনই শুরু হয় উদ্বাস্তু ঐক্য ভেঙে ফেলার প্রচেষ্টা। উপন্যাসটির শিল্পগত বিচারে নয়, সময়ের দলিল হিসাবে বাঙালি নৃতত্ত্ববিদের যাদুঘরে রক্ষিত থাকবে এ প্রত্যাশা করা যায়।

ব্যর্থতাকে ছদ্ম আবরণের আড়ালে ঢেকে না রেখে এ কথা স্বীকার করে নেওয়া ভালো বাংলা উপন্যাসে ৫০-৬০-এর দশকের সময়ের তেমন কোনো পদসঞ্চার আমরা লক্ষ্য করি না। ৪২-এর ভারত-ছাড় আন্দোলন, ৪৩-এর দুর্ভিক্ষ বা অনতিপরের ৭০-এর নকশালবাড়ি আন্দোলন বাঙালি ঔপন্যাসিককে যেভাবে আলোড়িত করেছিল ৪৭-এর দেশভাগ বা উদ্বাস্তু স্রোত বাঙালি ঔপন্যাসিকের মননভূমিকে সেভাবে ছুঁয়ে গেল না। অথচ বাঙালির বিগত সহস্র বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি এই দেশভাগ। দেশভাগ শুধুমাত্র একটা ঘটনা নয়। ফাঁসির দড়িতে ঝুলে থাকা একটি জাতির বেঁচে ওঠার নিরন্তর সংগ্রামের অন্য নাম

দেশভাগ। আজ বেলঘড়িয়া, বাঘাযতীন, যাদবপুর, অশোকনগর, নিউব্যারাকপুরের বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে যে সুরম্য অট্টালিকা, আবাসন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে একদিন হোগলা গাছের বন কেটে জলাভূমি পরিস্কার করে সেখানেই বাসভূমি রচনা করেছিল এই উদ্বাস্তুরা, এই উদ্বাস্তুদের হাত ধরেই প্রায় চার দশক জুড়ে বামপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করেছে। কিন্তু ইতিহাসের কোনো পদছাপ উপন্যাসে দলিল হয়ে থাকল না। সেই সব উদ্বাস্তু মানুষের উত্তরপুরুষেরাও ভুলতে বসেছেন তাদের অগ্রজ পিতৃপুরুষের সেসব অলিখিত সংগ্রামের ইতিহাস। আর হয়তো সে কারণেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির চাকা আজ ঘুরে গেছে অন্যপথে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আজ উল্টোরথের যাত্রী।

তথ্যঋণ :

১। ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশবিভাগ— লাডলীমোহন রায়চৌধুরী।

২। বাংলায় কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ— রণেন সেন।

৩। পশ্চিমবঙ্গের শরণার্থী সমস্যা— অনিল সিংহ।

৪। বিশশতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি — অরবিন্দ পোদ্দার।

৫। সাতচল্লিশ থেকে সত্তর এবং আগে পরে — ভারতজ্যোতি রায়চৌধুরী।

৬। ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য— অশ্রুকুমার সিকদার।

৭। কেন উদ্বাস্তু হতে হ'ল— শ্রীদেবজ্যোতি রায়।

৮। বাংলা উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবন— তাপস ভট্টাচার্য।

৯। দেশভাগ, স্মৃতি আর স্তব্ধতা— সেমন্তী ঘোষ সম্পাদিত।

১০। The Marginal Men— প্রফুল্ল চক্রবর্তী।

১১। Documents of Indian Communist Party India Wins Freedom মৌলানা আবুল কালাম আজাদ।

১২। উদ্বাস্তু— হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৩। বিতর্কিকা— প্রসঙ্গ দেশভাগ, অক্টোবর ২০১৩, অভ্র ঘোষ, মিলন দত্ত, তপস্যা ঘোষ সম্পাদিত।

১৪। উজাগর — ত্রয়োদশ বর্ষ, ১৪২৩ উত্তম পুরকাইত সম্পাদিত।